এই সময়

* কথা সরিৎ *

ধর্মের প্রথম প্রমাণ হলো— ত্যাগ।
ত্যাগ না হলে কোন ধর্ম হতে পারে না।

—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

খাদ্যসংকট

এক দিকে আসমুদ্রহিমাচল যখন প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থীদের যুদ্ধনাদে প্রকম্পিত, ঠিক তখনই দেশের সাধারণ মানুষের নুন আনতে পান্তা প্রায় ফুরানোর জোগাড়। নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের দাম আকাশছোঁয়া, ক্রমেই সাধারণ মানুষের সাধ্যের পরিধির বাইরে। দুর্মূল্য কোনও খাবার নয়, প্রতি দিনের হেঁশেলের সামান্য আলু পেঁয়াজের জোগাড় করতেও সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। আরও উদ্বেগের বিষয়, যুযুধান দলগুলির কারও বক্তব্যেই এই সমস্যার আশু সমাধানের কোনও চিহ্ন প্রায় দুর্লক্ষ্য। অথচ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে এই বিষয়টিই উঠে আসা উচিত রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতেই। কারণ, শুধু দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাতেই নয়, বিভিন্ন সমীক্ষাতেও জীবনের মানের যে নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, তা আশঙ্কাজনক। যেমন, বণিকসভা অ্যাসোচ্যাম-এর সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধির ফলে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষরা পুষ্টির ক্ষেত্রে আপস করতে বাধ্য হচ্ছেন। মূলত শহরে করা এই সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে খুচরো পণ্যের মাত্রাতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধির ফলে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রায় ৭২ শতাংশ মানুষই শাক-সবজি, ফল ও ডালের মতো খাদ্যপণ্য কেনা প্রায় ৪০ শতাংশ কমিয়ে দিয়েছে। শহুরে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনের মানই যখন এই গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন, বোঝা কঠিন নয় যে দারিদ্ররেখার নীচে থাকা মানুষদের জীবনের মান কোন তলানিতে পৌঁছতে পারে। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর ২০১১ সালের বুভুক্ষা সূচক অনুসারে অপুষ্টিতে ভোগা ৫ বছরের কমবয়সী শিশুদের ৪০ শতাংশের বাস যে তিনটি দেশে, তার মধ্যে অন্যতম ভারত। এই সংস্থার বিশ্লেষণ অনুযায়ী অপুষ্টির প্রেক্ষিতে ভারত এখনও আশঙ্কাজনক পরিস্থিতিতে। কাজেই যখন এই সার্বিক অপুষ্টি দ্রুত হারে কমাটাই প্রার্থিত, তখন আপাতত যা দেখা যাচ্ছে তা প্রায় উলটোপুরাণ। এই প্রেক্ষিতে প্রশ্ন ওঠে— সমস্যাটির সুরাহা হচ্ছে না কেন?

অথচ সমস্যার মূল কারণগুলি যে একেবারে অজানা, তা-ও নয়। যেমন খাদ্যপণ্য মজুত ও সরবরাহের সমস্যা। একটি সংস্থার সাম্প্রতিক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাবে ভারতে প্রতি বছর প্রায় ১৩৩০০ কোটি টাকার ফল ও শাকসবজি নষ্ট হয়। যা ফল ও শাকসবজির মোট উৎপাদনের প্রায় ১৮ শতাংশ। তার সঙ্গে শস্যকে হিসেবে ধরলে অপচয়ের মোট মূল্যমান দাঁড়ায় ৪৪ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ, ২০১২-২০১৩ অর্থবর্ষে ভারতের পরিকল্পিত রাজস্ব আয়ের প্রায় ৩ শতাংশ। এই বিপুল অপচয়ের কারণ হিমঘর এবং উপযুক্ত পরিবহণ ব্যবস্থার অভাব। বর্তমানে দেশের ৬৩০০টি হিমঘরে ৩০১১ কোটি টন খাদ্যশস্য মজুত রাখা যায়। কিন্তু চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজন ৬১০০ কোটি টন খাদ্যশস্য মজুতের ব্যবস্থা। অর্থাৎ, মজুতের বর্তমান ক্ষমতাকে প্রায় দ্বিগুণ বাড়ানো দরকার। নইলে শস্য, ফল ও শাকসবজির অযথা অপচয় বন্ধ করা কঠিন। কাজেই, কার্যকারণ সম্পর্কটি খুব একটা জটিল নয়। এক দিকে খাদ্যের চাহিদা বাড়ছে। কিন্তু সেই চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের জোগানে টান পড়ছে। কারণ, উৎপাদনের স্বল্পতা নয়, উৎপাদনের পরবর্তী পর্বে মজুত ও সরবরাহ ব্যবস্থার অদক্ষতা। ফলত, খাদ্যের দাম ক্রমবর্ধমান। কার্যকারণ সম্পর্ক যখন স্পষ্ট, সমাধানও দুঃসাধ্য নয়। অন্তত, তাত্ত্বিক ভাবে। দরকার মজুত ও সরবরাহ ব্যবস্থায় বড়ো হারে বিনিয়োগ। কিন্তু সমস্যা এই সমাধানের বাস্তব রূপায়ণে। রাজনৈতিক দলগুলির কারও নজর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-এর মুদ্রানীতির দিকে, কেউ আবার খুচরো বাজারে প্রত্যক্ষ মূল্যনিয়ন্ত্রণে বিশ্বাসী। কিন্তু সেই পদক্ষেপের কোনও দীর্ঘমেয়াদি সুফল দেখা যাচ্ছে না। কারণ, দীর্ঘমেয়াদি যে বিনিয়োগ দরকার তা নিয়ে কোনও সার্বিক উদ্যোগ অনুপস্থিত। কিন্তু, খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধির যদি দীর্ঘমেয়াদি সমাধান না হয়, ভোটবাক্স তার প্রভাবমুক্ত থাকবে কি?

বরাহ-নন্দন!

মানুষ, বিশেষ করে বাঙালি, কারও উপর রেগে গেলে, তাকে অনেক কিছু বলেই ডেকে থাকে। তার একটা বড়ো কারণ, বাঙালি এখনও মুখ থাকতে হাত কেন তত্ত্বেই বিশ্বাস করে। সে যাক গে। কিন্তু একটি হাতেগরম সমীক্ষা করলে দেখা যাবে, ওই অনেক কটু কথার মধ্যে, শুয়োর ও বাঁদর টেনেই বেশির ভাগ অপমান বা অপদস্থ করা হয়। কেন? এত কিছু তো ছিল। সাপ, বেজি, হায়না, আমাডিলো। কিন্তু না, শুয়োর ও বাঁদরই অধিক পছন্দ। তাও বাঁদরের ব্যাপারটা মেনে নেওয়া যায়। যে তাদের থেকেই মানুষের বিবর্তন, ফলে কেউ যদি অন্যকে বাঁদরের বাচ্চা বলে, যুক্তির দিক দিয়ে ভুল বলা হচ্ছে না। কিন্তু শুয়োর?

এখানেই দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন জর্জিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউজিন ম্যাকার্থি। সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে তিনি এমনটাই দাবি করেছেন। তাঁর তত্ত্ব অনুযায়ী মানুষ আসলে শুয়োর ও বাঁদরের সংকর। আর একটু ভেঙে বললে, পুরুষ শুয়োর ও মহিলা শিম্পাঞ্জির সংকরায়ণের ফল হল মানুষ। এবং তা যদি সত্যি প্রমাণিত হয়, তা হলে তো স্পষ্ট এই দুই শব্দের প্রতি মানুষের বিশেষ টান। ইউজিন বলছেন, জিনগত দিক থেকে যেমন মানুষের সঙ্গে শিম্পাঞ্জির প্রভূত মিল, আবার একই ভাবে, অনেক অমিলও। তিনি এ বার বলছেন, শিম্পাঞ্জি সঙ্গে একমাত্র কোনও না-বানর মিলিত হলেই, মানুষের মতো প্রাণীর উদ্ভব সম্ভব। এবং না-বানরদের

কংগ্রেস-বিজেপির বাইরে তৃতীয় বিকল্প হয়ে উঠতে পারবে 'আপ'?

কাল দিল্লিতে ভোটই তার আভাস দেবে। মতাদর্শ এবং সাংগঠনিক শক্তি, দু'দিকেই আম আদমি পার্টির অগ্নিপরীক্ষা।

লিখছেন **মইদুল ইসলাম**

আজ থেকে ঠিক দু'বছর আগে দিল্লির কংগ্রেস নেতারা 'ইন্ডিয়া এগেইনস্ট কোরাপশন' নামক সামাজিক আন্দোলনটিকে নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। কারণ হিসেবে বলা হয়েছিল, সমাজের এক দল স্বঘোষিত অভিভাবক কেন্দ্রীয় সরকার বা দিল্লি সরকারকে স্তব্ধ করে দিতে পারে না। কংগ্রেসের এই সব সমালোচকের বক্তব্য ছিল, যেহেতু এই আন্দোলনের দাবি অনুযায়ী সরকার ইতিমধ্যেই সংসদে জনলোকপাল বিল পেশ করেছে, কাজেই এই আন্দোলনকে উপেক্ষা করাই উচিত। বলেছিলেন, এই নিয়ে আর সময় নষ্ট না করে অন্যান্য বিষয়ের দিকে নজর দেওয়া হোক। তখন আরও একটি সমালোচনা উঠে এসেছিল, দুর্নীতি-বিরোধী আন্দোলনকারীদের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক ভাবে অংশগ্রহণ না করার কারণে। এক দিক থেকে সমালোচনাটি যুক্তিসঙ্গত, কারণ আন্দোলনে এমন কিছু কট্টর রাজনীতি-বিরোধী ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যাঁদের মতে রাজনীতি মানেই খারাপ ব্যাপার এবং সক্রিয় রাজনীতির মাধ্যমে এই দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থাকে পালটানো সম্ভব নয়। অন্য দিকে, ভারতীয় জনতা পার্টি এই আন্দোলনের প্রতি বেশ নরমসরম মনোভাবই নিয়েছিল। কারণ তারা হিসেব কষেছিল যে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার ও দিল্লি সরকারের বিরুদ্ধে যে কোনও দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন তাদের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে দুর্বল করবে, এবং ফলত তারা লাভবান হবে।

রয়টার্স

কিন্তু এর এক বছর পরে এমন এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটে যার ফলে এই দুই দলই তাদের ধারণা পাল্টাতে বাধ্য হয়। 'ইন্ডিয়া এগেইনস্ট কোরাপশন' আন্দোলনের সদস্যরা গঠন করেন 'আম আদমি পার্টি' (আপ)। নেতৃত্বে অরবিন্দ কেজরিওয়াল, প্রশান্ত ভূষণ, শাজিয়া ইলমি, যোগেন্দ্র যাদব এবং কুমার বিশ্বাস। ফলে বিচ্ছেদ ঘটল আন্না হাজারে, কিরণ বেদী বা এন সন্তোষ হেগড়ের মতো দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে, যাঁরা নির্বাচনী রাজনীতিতে যোগদানের বিরোধিতা করেছিলেন।

> প্রচার অভিযানে বার বার বলা হচ্ছে, দল যদি সরকার গঠন করে, আম আদমি পার্টির মন্ত্রীরা গাড়িতে কোনও লাল আলো ব্যবহার করবেন না, সরকারের দেওয়া বাড়িতে থাকবেন না।

এই মুহূর্তে কংগ্রেস এবং ভারতীয় জনতা পার্টি— দুই দলই ৪ ডিসেম্বর-এর দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে এই নতুন রাজনৈতিক দলের সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ে আশঙ্কিত। ভারতীয় জনতা পার্টি ভয় পাচ্ছে যে দিল্লির জনসাধারণের মধ্যে আম আদমি পার্টির জনপ্রিয়তার জন্য কংগ্রেস-বিরোধী ভোটের সবটা তারা পাবে না। অন্য দিকে কংগ্রেস আম আদমি পার্টির বিশ্বাসযোগ্যতার মধ্যে বিপদের গন্ধ পাচ্ছে। তারা আশঙ্কিত আম আদমি পার্টির কর্মসূচি নিয়ে যেখানে বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি, জল সরবরাহ এবং দিল্লি সরকারের আমলে ব্যাপক দুর্নীতির মতো মৌলিক সমস্যাগুলোর কথা তুলে ধরা হয়েছে। সর্বোপরি আম আদমি পার্টির বিশ্বাসযোগ্যতা ভারতীয় জনতা পার্টির নেতাদের থেকে বেশি, কারণ ভারতীয় জনতা পার্টির নেতাদের অনেকেই দুর্নীতিগ্রস্ত এবং ফৌজদারি অভিযোগে অভিযুক্ত। কাজেই এই প্রেক্ষিতে বলা যেতেই পারে, যথেষ্ট ভোট পেয়ে আম আদমি পার্টির শীলা দীক্ষিতের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারের ক্ষমতায় ফেরার পথ রুদ্ধ করে দেওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এখন প্রশ্ন হল— আমরা যে রাজনৈতিক বিকল্পের জন্য প্রতীক্ষায় ছিলাম, আম আদমি পার্টি কি তা হয়ে উঠতে পারবে? আর যদি হয়ে ওঠে, তবে কারা এই আম আদমি পার্টিকে সমর্থন জোগাচ্ছে এবং কেন?

সাধারণ মানুষদের বেশ কয়েকটি অংশের সমর্থন পাচ্ছে আম আদমি পার্টি। প্রথমত, নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটি অংশ, যাঁদের জীবিকা বেসরকারি কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে যুক্ত, এবং যাঁরা বিশ্বের অর্থনৈতিক মন্দার আবহে ভবিষ্যৎ রুজিরোজগারের নিশ্চয়তা নিয়ে উদ্বিগ্ন। এই অংশ কংগ্রেস এবং ভারতীয় জনতা পার্টি নয়া উদারবাদ অর্থাৎ নিওলিবারেলিজ্‌ম-এর যে সংস্করণ চালু করেছে, এবং সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করে রাজনৈতিক দল এবং কর্পোরেট শ্রেণির পারস্পরিক আঁতাত যে ভাবে প্রকাশ্যে এসে পড়েছে, তার ফলে নিজেদের প্রতারিত মনে করছে। অথচ আজ থেকে দুই দশক আগে, এই শ্রেণিই নয়া উদারবাদকে বন্ধনমুক্তির পথ মনে করেছিল। ভেবেছিল, নয়া উদারবাদ ব্যবস্থার মধ্যে স্বচ্ছতা এবং দায়িত্ববোধ নিয়ে আসবে, লাইসেন্স-পারমিট জমানার শেষের দিকে গেঁড়ে বসা স্বজনপোষণ এবং দুর্নীতির পরিবর্তে মেধার ভিত্তিতে সুযোগ পাওয়া যাবে। এই শ্রেণি ধরেই নিয়েছিল যে নয়া উদারবাদের সদর্থক দিকগুলি কোনও নৈতিক আপস ছাড়াই সামাজিক ঊর্ধ্বগামিতাকে নিশ্চিত করবে। কিন্তু সময় যত এগিয়েছে, বোঝা গিয়েছে যে উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ এবং বিশ্বায়নের এই জমানায় স্বজনপোষণ এবং দুর্নীতি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের জমানার থেকেও দ্রুত হারে বেড়েছে। কাজেই নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণির এই অংশ নয়া উদারবাদী ব্যবস্থাকে ত্রুটিমুক্ত করার লক্ষ্যে আম আদমি পার্টিতে যোগ দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, আম আদমি পার্টি সার্বিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটা অংশের থেকেও সমর্থন পাচ্ছে, যাঁরা সরকারি চাকুরে, ছোট দোকানদার, ছোট ব্যবসায়ী অথবা ডাক্তার, শিক্ষক, উকিল বা সাংবাদিকদের মতো পেশাদার। যাঁরা মূল্যবৃদ্ধি, বিদ্যুতের দাম, জল সরবরাহ, নাগরিক পরিকাঠামো ইত্যাদি দৈনন্দিন সমস্যা নিয়ে তিতিবিরক্ত। তার উপর নয়া উদারবাদী জমানায় রাষ্ট্র এবং নাগরিকের মধ্যে চুক্তির পুরনো আদলটাও পাল্টে গিয়েছে। এখন সামাজিক কল্যাণ প্রকল্পের লক্ষ্য মূলত দরিদ্র শ্রেণি। আপাতত মধ্যবিত্ত শ্রেণির এই অংশ তার আওতার বাইরে। কাজেই যখন সরকারি ক্ষেত্র দ্রুত বিলীয়মান, সর্বত্র পথ ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে কর্পোরেট ক্ষেত্রকে, তখন পুরনো মধ্যবিত্ত শ্রেণির অনেকেই এক রাজনৈতিক বিকল্প খুঁজছেন যার মাধ্যমে তাঁরা নিজেদের ক্ষোভ জানাতে পারেন।

তৃতীয়ত, নিম্নবর্গের এক অংশ, যাঁদের মধ্যে আছেন পরিবহণ কর্মী, ধোপা, ঝাড়ুদার বা পরিচারক পরিচারিকারা। ভারতের মেট্রোপলিটান শহরগুলোর এই নীচের তলা শুধু শোষিতই নয়, মূল ধারার একেবারে প্রান্তে তাঁদের বেঁচে থাকা। কিন্তু প্রান্তিক হলেও স্রেফ সংখ্যার কারণেই সরকার নির্বাচনে তাঁদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এই মানুষরা চলতি রাজনৈতিক দলগুলির স্থানীয় রাজনীতিবিদদের উপর অসন্তুষ্ট। তাঁদের ক্ষোভ যে এই সব নেতারা গরিব মানুষদের সামাজিক কল্যাণের জন্য বরাদ্দ অর্থ নয়ছয় করছেন। কাজেই যেহেতু কংগ্রেস, এবং ভারতীয় জনতা পার্টির মতো সাবেকি দলগুলি তাঁদের সমস্যার সুরাহা করতে ব্যর্থ, তাঁরাও আম আদমি পার্টির মধ্যে এক রাজনৈতিক বিকল্পের সন্ধান পাচ্ছেন।

সর্বোপরি আছেন ছাত্র এবং বেকার যুবকরা। আম আদমি পার্টি এই শ্রেণিকে আকৃষ্ট করেছে। কারণ, তাদের নতুন রাজনৈতিক ভাষা। যে ভাষায় মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রতিষ্ঠানবিরোধিতার স্লোগান, চলতি স্থিতাবস্থাকে পাল্টানোর আহ্বান, রাজনৈতিক প্রতীকের উদ্ভাবনী ব্যবহার এবং দিল্লির সত্তরটি কেন্দ্রেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে প্রার্থী নির্বাচনের গণতান্ত্রিকতা। যে ভাষা মূল ধারার দলগুলির পরিবারতন্ত্র, তোষামোদ ও খোসামুদির ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচনের রীতির থেকে আলাদা। আম আদমির ধর্ষণবিরোধী প্রতিবাদ আন্দোলন এবং নারী সুরক্ষার দাবিও তাদের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছে। তার উপর, সংগঠনের মধ্যে ছাত্র, যুবক, দলিত এবং সংখ্যালঘুদের যে মাত্রায় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তা-ও ভারতের এই নবতম রাজনৈতিক দলের ভোটবাক্সে ভালো রকম প্রভাব ফেলতে পারে।

এর সঙ্গে আম আদমি পার্টি বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় প্রতীকের থেকে নিজেদের দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করছে। যেমন, প্রচার অভিযানে বার বার বলা হচ্ছে, তাদের দল যদি সরকার গঠন করে, তা হলে আম আদমি পার্টির মন্ত্রীরা গাড়িতে কোনও লাল আলো ব্যবহার করবেন না, তাঁরা সরকারের দেওয়া বাড়িতে থাকবেন না। অস্যার্থ, তাদের যদি নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে সাধারণ মানুষের সেবা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়, তবে শাসক এবং শাসিতের মধ্যে অসম সম্পর্কটাই পাল্টে যাবে। আম আদমি পার্টির প্রচারের মূল ভাবনা হল, সাধারণ মানুষ স্রেফ আম আদমি পার্টির প্রার্থীকেই ভোট দিচ্ছেন না, তাঁরা নিজেরাই নিজেদের নির্বাচিত করছেন। কাজেই সাধারণ মানুষ যদি নিজেদের জয় চান, তা হলে তাঁরা ভোট দিন অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং আম আদমি পার্টির অন্যান্য প্রার্থীদের।

প্রচারের এই নতুন কৌশল নিশ্চিত ভাবে দিল্লির ভোটারদের প্রভাবিত করেছে। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের করা প্রাক-নির্বাচনী সমীক্ষায় ইতিমধ্যেই পরিষ্কার যে দিল্লির রাজনীতিতে আম আদমি পার্টি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে চলেছে। যোগেন্দ্র যাদবের করা আম আদমির পার্টির নিজস্ব সমীক্ষাতেও দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে ভালো ফলের পূর্বাভাস পাওয়া গিয়েছে। ৮ ডিসেম্বর-এর মধ্যে বোঝা যাবে, আম আদমি পার্টি সরকার গঠন করতে পারবে নাকি বিরোধী আসনে বসবে। কিন্তু নির্বাচনে যা-ই ঘটুক না কেন, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে আম আদমি পার্টির বিকল্প হয়ে ওঠার প্রতিশ্রুতি বাস্তবে কী আকার নেয়, তা স্পষ্টতর হবে। বোঝা যাবে জাতীয় স্তরে তারা তৃতীয় কোনও রাজনৈতিক পরিসর নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে কি না।

দিল্লির ভোটারদের একটা বড়ো অংশ কংগ্রেসকে ১৯৮৪ সালে শিখবিরোধী দাঙ্গার স্থপতি হিসেবে দেখে। ভারতীয় জনতা পার্টিকে মনে করে সাম্প্রদায়িক এবং ফ্যাসিবাদী এক দল। এবং এই দুই দলই নয়া উদারবাদী নীতি বলবৎ করার প্রতিযোগিতায় একে অন্যকে টেক্কা দিচ্ছে। কাজেই এই দুই যুযুধান দলের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে, আম আদমি পার্টির প্রধান চ্যালেঞ্জ হল এক বিকল্প মতাদর্শ তুলে ধরা, এবং কংগ্রেস ও ভারতীয় জনতা পার্টির বিপুল সাংগঠনিক শক্তির মোকাবিলা করা। যদি আম আদমি পার্টি সে কাজ করতে সক্ষম হয়, তা হলে সাধারণ মানুষ হয়তো ভবিষ্যতে এই তৃতীয় রাজনৈতিক বিকল্পকেই বেছে নিতে পারেন।

লেখক সিমলার 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্সড স্টাডি'-র ফেলো

কতকথা

কেউ টাকা দেবেন না, কেউ টাকা নেবেন না।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
চিটফান্ড নিয়ে পার্টিকর্মীদের হুশিয়ারি

চার পুরুষ ধরে এই দুটি (নেহরু-গান্ধী) পরিবার সারাক্ষণ কেবল দারিদ্রের কথা বলে আসছেন।

নরেন্দ্র মোদী
কংগ্রেসের ব্যর্থতা প্রসঙ্গে।

হাসান রুহানি আসলে ভেড়ার চামড়া পরা নেকড়ে।

বেঞ্জামিন নেতানইয়াহু
(ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী)
ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানির প্রতি বিষোদ্গার। ইরানের সঙ্গে আন্তর্জাতিক মহলের চুক্তির পর।

প্রথমে ওরা আপনাকে আটকাতে চেষ্টা করবে। তারপরে ওরা আপনার (কোম্পানির) কাজ কারবারে নাক গলাবে। তারপরে আপনি জিতে যাবেন। আমি সত্যিই বিশ্বাস করি এটাই হয়। কারণ ক্ষমতার কেন্দ্র বদলে গিয়েছে।

এরিক স্মিট
(গুগল-এর এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান)
ইন্টারনেটের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে